সুনন্দা দেবীর
নিবেদন
এস. ডি. প্রোডাকসান্সের
সিংহদ্বার
SKDAS
2-9-49

সুনন্দা ব্যানার্জীর

নিবেদন

সিংহদ্বার

এস. বি. প্রোডাকসন্সের কথাচিত্র

প্রযোজনা : রণজিত বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

কাহিনী : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ : সুরশিল্পী : রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত : শব্দযন্ত্রী : গৌর দাস : রাসায়নিক : ধীরেন দাশগুপ্ত

গীতকার : শৈলেন রায় : সম্পাদনা : কালী রাহা

সহযোগী-পরিচালক : মানু সেন : চিত্রনাট্য-সহকারী : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও নীতীশ রায় : সহকারী : বিমল রায় চৌধুরী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প নির্দ্দেশক : বিজয় বোস : রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী

সহকারীগণ—চিত্রশিল্পে : অনিল ঘোষ : শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ
সঙ্গীতে : উমাপতি শীল : সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী

আলোক-সম্পাতে : নরেশ সমাদ্দার, কেষ্ট বোস, অনিল দত্ত

যন্ত্র-সঙ্গীতে : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা : স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, ননী চ্যাটার্জ্জী, সামান্য রায়, অমূল্য দাস

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে "আর-সি-এ" শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : লক্ষ্মী জুয়েলারী ওয়ার্কস

ভূমিকায় : সুনন্দা দেবী, অলকা, অসীমকুমার, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্যাম লাহা, ফণি বিদ্যাবিনোদ, পাপা, নমিতা, ধীরেশ, গোপাল, ধীরাজ দাস, সুরেন চৌধুরী, নকুল, স্বপনকুমার, টোটন প্রভৃতি

পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড

কাহিনী

জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ নীলামে উঠেছে। কিনছেন সর্ব্বেশ্বর রায়। সর্ব্বেশ্বর রায় নরেন্দ্রনারায়ণের গরীব আত্মীয়, যাকে নরেন্দ্রনারায়ণ তাড়িয়ে দিয়েছিলেন অপমান ক'রে তার স্পর্দ্ধিত আকাঙ্খার জন্যে। দরিদ্র সর্ব্বেশ্বর চেয়েছিলেন জমিদার-ভগিনীর পাণিপীড়ন করতে। সর্ব্বেশ্বরের প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া দূরে থাক্ অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন। সেদিনের জ্বালা সারাজীবন সর্ব্বেশ্বর ভুলতে পারেননি। আজ বুঝি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছেন সর্ব্বেশ্বর রায়।

ভাগ্যলক্ষী বহুদিন পরে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। নরেন্দ্র-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত কিনে নিলেন সর্ব্বেশ্বর রায়। কিন্তু নিজের নামে কিছুই তিনি কিনলেন না। তাঁর নায়েব মজুমদারের বেনামীতে নরেন্দ্র নারায়ণের সব কিছু তিনি অধিকার করলেন, পারলেন না শুধু নরেন্দ্রনারায়ণের ভগ্ন আভিজাত্যের অটল দম্ভকে কিনে নিতে। কোন উদারতা দিয়ে জয় করা গেল না তাঁর অহঙ্কার।

রিক্ত নিঃস্ব নরেন্দ্রনারায়ণ কিশোরী কন্যা ইন্দ্রানীর হাত ধরে তাঁর প্রাসাদের সিংহদুয়ার পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সর্ব্বেশ্বর এসে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে। সর্ব্বেশ্বর বললেন, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমার সব সম্পত্তি তোমার মেয়েকে যৌতুক দিয়ে। নরেন্দ্র-নারায়ণ অবিকম্পিতভাবে প্রত্যাখান করলেন সে-দান।

অনুরোধ উপরোধ, ভবিষ্যৎ নিঃসহায়তা, মিনতি কিছুই তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারলনা। কঠিন ইস্পাতের মত তাঁর দম্ভ, অতীত ঐশ্বর্য্যের খাপ থেকে বেরিয়ে অতি বৃদ্ধ তলোয়ার সর্ব্বেশ্বরকে শেষ আঘাত করে সরে এল। পাথর ইঁটে জমাট সিংহদ্বার সেই নিভৃত নাটকের রইল নীরব সাক্ষী।

নরেন্দ্রনারায়ণ মেয়ের হাত ধরে পৌছলেন সেই গ্রামেই তাঁর কুলপুরোহিত গোঁসাইয়ের বাড়ীতে। কয়েকদিন পরে সেইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইন্দ্রানীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে সে জীবনে কখনও সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করবেনা।

নরেন্দ্রনারায়ণের গ্রাম্য এই প্রাসাদে সর্ব্বেশ্বর থাকতে আসেন নি। নায়েব মজুমদারের জিম্মায় তিনি সব কিছু রেখে গেলেন। মজুমদারকে জানিয়ে গেলেন, যদি কোন দিন, ইন্দ্রাণী ফিরে আসে, তা'হলে এই সিং-বাড়ী ও তার যাবতীয় সম্পত্তির সেই-ই অধিকারিণী হবে। সিং-দেউড়ীর পুরাতন দারোয়ান পাঁড়ের ওপরেও সিং-বাড়ীর তত্ত্বাবধানের আংশিক দায়িত্ব দেওয়া রইল।

তারপর দশ বছর কেটে গেছে। সর্ব্বেশ্বর রায় সিং-বাড়ীতে আর ফিরে আসেন নি। জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর অনমিত আভিজাত্যের জিদ নিয়ে যে-লোকে গিয়েছেন, সর্ব্বেশ্বরও গেছেন সেখানে। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র শঙ্কর জানত সিং-বাড়ীর সম্পত্তি তার জন্যে

বাবা রেখে যাননি, সুতরাং তার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন সিং-বাড়ীতে আসবার। মাঝখান থেকে মজুমদার তার কূট নায়েবি-বুদ্ধির সাহায্যে এই বৃহৎ জমিদারির মালিকানার সর্ব্বসত্ত্ব উপভোগ করে এসেছেন। শুধু প্রভুভক্ত পাঁড়ে-ই যা মাঝে মাঝে মজুমদারের পরের ধনে পোদ্দারি নিয়ে গোলযোগ বাধাত।

আর একদিকে সিংবাড়ীর লক্ষী-জনার্দ্দনের সেবায়েৎ সংব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের বাড়ীতে কিশোরী ইন্দ্রাণী আজ তরুণী ইন্দ্রাণী হয়ে উঠেছে। মর্য্যাদাভিমানিনী মেয়ে গোঁসাইকাকার বাড়ী ছেড়ে স্বাবলম্বী হয়ে অন্য একটি বাড়ীতে উঠে গেল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পড়িয়ে কোন রকমে তার একার দিন চলে যাবে। এমন সময়ে গ্রামে এসে পৌছল জীবন, গ্রামেরই ছেলে। দেশভক্তির কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছুদিন জেলেও থেকে এসেছে। ইন্দ্রাণীকে জীবন দিদি বলে ডাকে। এবারসে গ্রামে থেকে গ্রামের সেবা করবার আদর্শ নিয়ে কাজ করবে। ইন্দ্রাণী তার আদর্শকে উৎসাহিত করল।

কিন্তু ইন্দ্রাণী ও জীবনের এই সদিচ্ছাই গোলোযোগ বাধাল, মজুমদারের স্বার্থের সঙ্গে লাগল বিরোধ। প্রজাদের ওপর জুলুম করতে গেলে ইন্দ্রাণী তাদের সাহায্য করতে দলবল নিয়ে ছুটে আসে। রায়-দীঘির জল বন্ধ করে দিল মজুমদার। ইন্দ্রাণী রুখে দাঁড়াল। পাঁড়ে নিল ইন্দ্রাণীর পক্ষ। মজুমদার মনে মনে জানে ইন্দ্রাণীই সব কিছুর মালিক, সুতরাং বার বার তাকে হার মানতে হয়।

পরাজিত মজুমদার সহজে দমে যাওয়ার লোক নয়, পত্র লিখে সে সর্ব্বেশ্বর রায়ের পুত্র তরুণ যুবক শঙ্কর রায়কে আনাল গ্রামে, ইন্দ্রাণীর স্পর্দ্ধার বিচার করবার জন্যে। শঙ্কর জানত এ ব্যাপারে তার কিছু করবার নেই, তবু শুধু ইন্দ্রাণীকে দেখবার কৌতূহল নিয়ে সে এল গ্রামে।

কিন্তু কে জানতো যার বিচার করবার জন্য তাকে আনা হ'ল তাকেই সে হৃদয় সমর্পণ করে বসবে। শঙ্করকে একান্ত আপনার করে গ্রহণ করতে হ'লে পিতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অপমান হয়। কি করবে আজ ইন্দ্রাণী? গোঁসাই ইন্দ্রাণীকে বলেন, অপরকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করা পাপ!

জীবন অভিযোগ করে, সারাগ্রাম আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর জমিদারের ছেলে—তোমার পিতৃশত্রুর সঙ্গে মেলামেশা করে, তুমি তোমার আদর্শ ভুলতে বসেছ, দিদি?

জীবনের ভুল বোঝার সমাধান করে দিল শঙ্করের দান—গ্রামের উন্নতির জন্যে সিংবাড়ীর সকল সম্পত্তি সে দান করল।

স্বার্থপর মজুমদার উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল শঙ্করের এই ঔদার্য্যে। ইন্দ্রাণী নিজের মনের দ্বিধা ও সংশয় পারল না জয় করতে। তাকে চলে যেতে হবে—নিজের কাছ হ'তে নিজেই পালিয়ে যাবে সে।

তবে কি হৃদয় হয়ে যাবে মিথ্যা, একদা দর্পিত আভিজাত্যের জিদই হবে বড়।

বিধাতার লীলারহস্যে এমন সময়ে কেঁপে উঠল পৃথিবী। এল ভূমিকম্প। সুরু হ'ল অদৃশ্য শক্তির ভাঙার মধ্যে গড়ার খেলা। ভেঙে পড়ল সিংহদ্বার।

•

গান

এক

মন মানিকের পশরা তোর ধুলায় ছড়ালি
ও মানিক তুল্‌বে না কেউ তুল্‌বে না
সবার লাগি ভুল্‌বি ও তুই
তোর লাগি কেউ ভুল্‌বে না।
কেন তুই মিথ্যে আশায়
জ্বালিস্ প্রাণে সূর্য্যটারে
ওরা যে চোখ বুজে রয়
নিত্যকালের অন্ধকারে
ওরা যে অন্ধকুঁড়ি বন্ধ প্রাণের
দলগুলি আর খুল্‌বে না।
ও তুই যতই টানিস্ কাছে
ওরা ততই যাবে দূরে
ওরা দেয় না ধরা গানে
ওরা দেয় না ধরা সুরে,
মিছে তোর বুকের আগুন
চোখের জলের কি দাম আছে
দেখে আর হাসে ওরা
বুকে ওদের মরণ নাচে।
জীবন দোলায় যত দোলাস
ওরা তো কেউ দুল্‌বে না
(ও মানিক তুল্‌বে না কেউ তুল্‌বে না)।

দুই

সত্যি কথা গল্প না, ছোট্ট হলেও অল্প না
অনেক দুঃখ জ্বালা পেয়ে
পাষাণ হ'ল রাজার মেয়ে
তার কথাটি বল্‌বো শুধু অন্য কিছু বল'ব না
রবির আলো ঝিমিয়ে আসে পাষাণ মেয়ের
ভাবনাতে
পাষাণ মেয়ের প্রাণ জাগেনা
আকাশে তাই চাঁদ কাঁদে
রাঙাতে ঠোঁট্ কুম্‌কুমেতে
রঙ জাগে বন কুসুমেতে
তবু মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে না সবাই করে জল্পনা
এমন সময় সে এক রাখাল
কী জানি কি যাদু জানে
পাষাণ মেয়ের প্রাণ জাগালো
একটি শুধু বাঁশীর তানে
পাষাণ মেয়ে জেগে বলে—
"রাখাল রাজা পরো গলে
আমার মালা তোমায় দিলাম নয় এ মিছে কল্পনা"।

তিন

কুয়োর ব্যাং হ'ল কি না দীঘির দখলদার
মজুমদারের ঠ্যাং ধ'রে ভাই দে তুলে আছাড়
ভাইরে দে তুলে আছাড়।
তেল বেড়েছে তেল বেড়েছে বেড়েছে তেল
ও ব্যাটার মাথায় ভাঙ্গো ঝুনো নারকেল
আর পাকা বেল।
ও ভাই আরশুলোরা হয় কি পাখী সব বিট্‌কেল
তবু তো চালচুলো নেই পরের ধনে
সেজেছে পোদ্দার
ভাইরে সেজেছে পোদ্দার।
ব্যাটাকে ধর ধর ধর ঢেলে দে মাথায় গোবর
জলেতে নজর দেছে গেছো ভেঁদড় মেছো ভেঁদড়
ধ'রে ভাই চ্যাং দোলা কর চ্যাং দোলা কর
চ্যাং দোলা কর।
ধ'রে দে জ্যান্ত কবর জ্যান্ত কবর জ্যান্ত কবর
চটি মেরে চট্‌পটাপট্ বুঝিয়ে দে ভাই কেমন
চটকদার
ভাইরে কেমন চটকদার।
বেটা যে বিষম হাঁদা নাদা পেটা
যেন রে কেউ কেটা ও বেজায় ঠেঁটা
ব্যাটা যে ছুকান কাটা ছুকান কাটা ছুকান কাটা
ঝাঁটা মার বুকে হাঁটা যমের বাড়ী সোজা পাঠা
হাবার ব্যাটা গবার নাতি ভবা মজুমদার
দূর ক'রে দে দূর দূর দূর দূর ক'রে দে
ব্যাটাকে দূর ক'রে দে দূর দূর দূর দূর ক'রে দে
দে ক'রে দে পগার পার।

চার

গগনে গগনে কে তুমি অলখ হাতে
তারা দীপগুলি বারে বারে যাও জ্বেলে
রাত্রি যখন আঁধারের পাখা মেলে।
হায়রে আমার ভাগ্যরাতের তারা,
তোমারে খুঁজিয়া আমি আজ দিশাহারা,
কালের রাখাল ছেড়ে যায় মোরে
ধূলায় বাঁশরী ফেলে।
ফুরানো পাত্র ভরিয়া অশ্রুজলে
দিনগুলি মোর যে পথে হারালো
রাত্রি সে পথে চলে।
সমুখে চাহি না টানিছে আমারে পিছে
জীবনে আমার জানি না পাথেয় কি যে
নিজেরে হারায়ে হায় রে হৃদয়
কি খেলা খেলিতে গেলে।

পাঁচ

মেনেছি হার যদি গো হার মানালে
থেকো না আর বাহিরে তুমি আড়ালে।
প্রাণেরি মাঝে শুনি যে জয় ভেরী
জীবনে মোর সহে না আর দেরী
তোমার লাগি ভুলিতে মোরে
যদি গো তুমি জানালে
থেকো না আর বাহিরে তুমি আড়ালে।
অচল তরী রহিল বাঁধা তীরে
সাগরে তব জোয়ার কি গো নাই।
লজ্জা ভয় ভাঙ্গিয়া দাও মোরে
তুফানে খেয়া ভাসায়ে দিতে চাই।
তোমারে পেতে যে বাধা আজো রয়
আপন হাতে তাহারে কর ক্ষয়
প্রেমের ধূপ যদি গো প্রাণে জ্বালালে
থেকো না আর বাহিরে তুমি আড়ালে।

শিবপুর

প্রাইমার পরিবেশনে আগামী ছবি

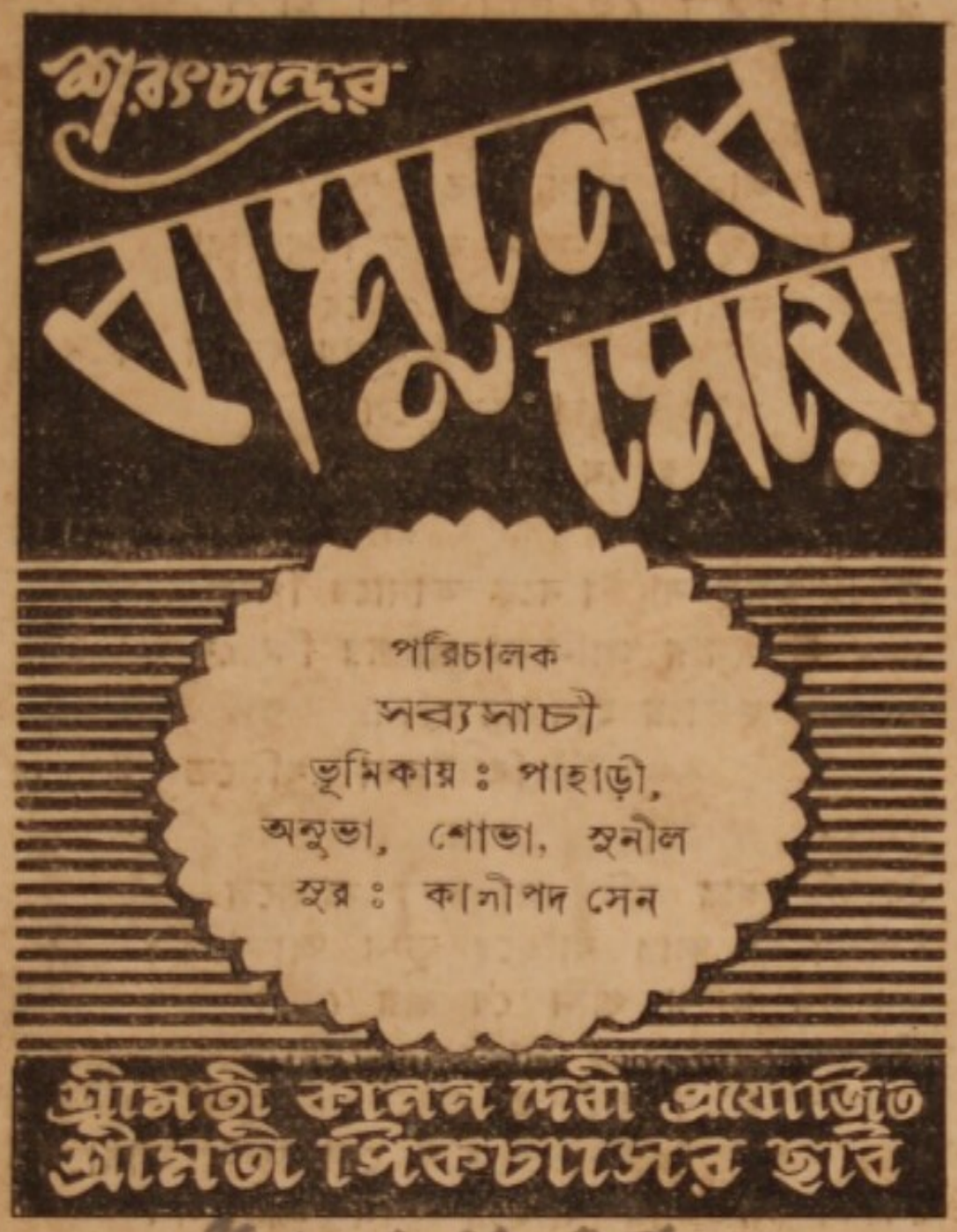

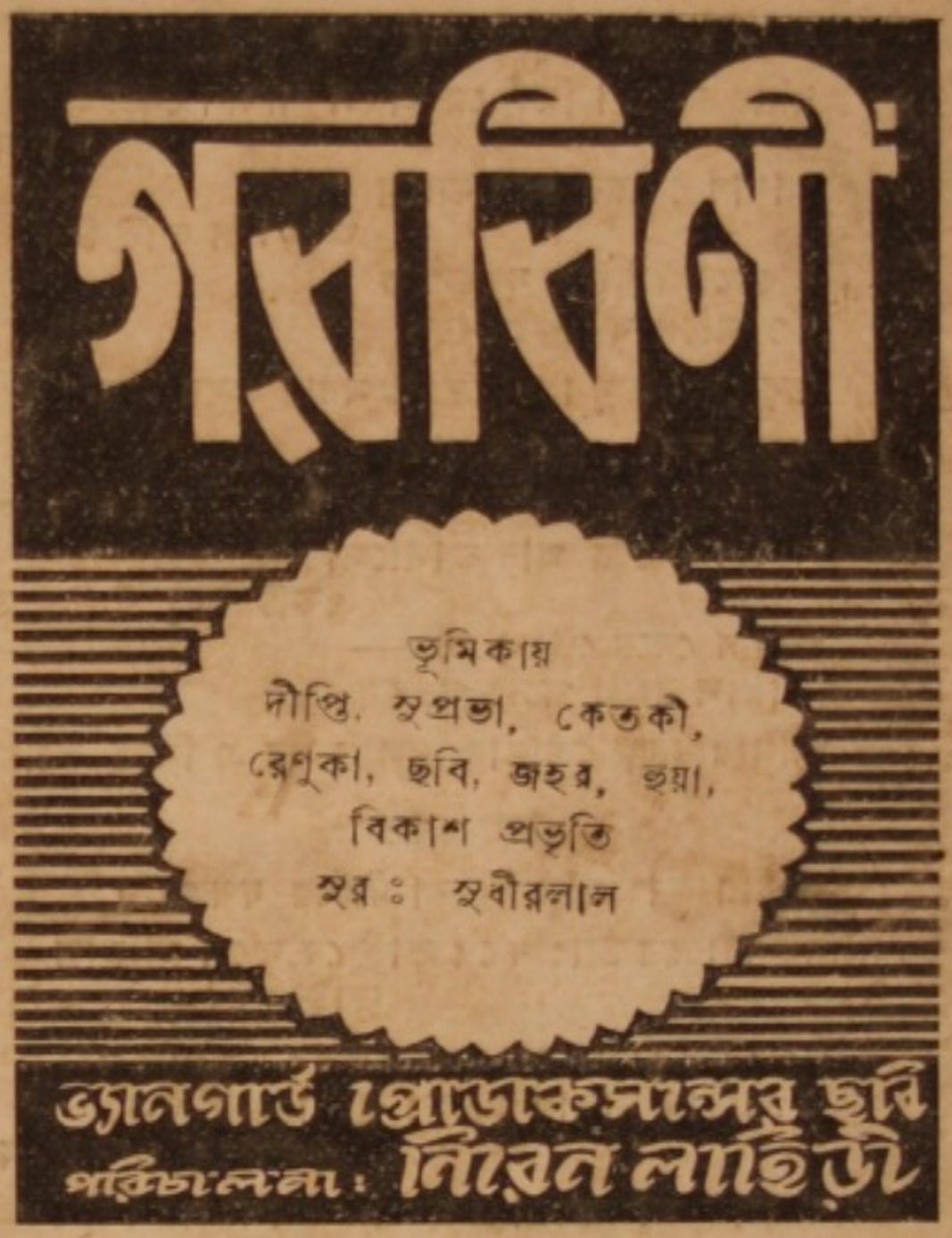

কালিদাস প্রোডাকসন্সের

যুগ দেবতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী অবলম্বনে

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড
হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য—দুই আনা]